بسم اللہ الرحمن الرحیم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)- এর ১৫ মে, ২০১৫ মোতাবেক ১৫ হিজরত, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত জুমুআয় আমি বলেছিলাম, পাঞ্জাব সরকার জামা'তের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বই-পুস্তক প্রকাশ বা প্রদর্শন করা যাবে না মর্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। সেখানকার কোন কোন পত্র-পত্রিকা সেই সংবাদ প্রকাশও করেছে। আজকাল মোবাইলে ছবি উঠিয়ে বার্তা প্রেরণের নানা ধরণের যেসব মাধ্যম রয়েছে, সেগুলোর কল্যাণে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো শুনে এবং দেখে লোকজন আমাকে পত্র লেখে এবং ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমেও উদ্বেগ প্রকাশ করে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এসব বিধি-নিষেধ আরোপ নতুন কোন বিষয় নয়।

আহমদীয়া জামা'তকে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাসে ধ্বজাধারী এসব আলেমের কথায় এহেন কার্যকলাপ পূর্বেও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এরা আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। তাদের এমন গর্হিত কর্মকাণ্ডে পূর্বেও জামা'তের কোন ক্ষতি হয় নি আর ভবিষ্যতেও হবে না, ইনশাআল্লাহ্। আর এরা ক্ষতি করতেও পারবে না। **কোন মা এমন কোন সন্তান জন্ম দেয় নি, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঐশী মিশনের অগ্রযাত্রা এরূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।** এসব ধ্বজাধারী আলেম এবং এদের পৃষ্ঠপোষক সরকার আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশে কোন না কোন ছুঁতো খুঁজে বেড়ায়। এই হিংসা প্রকাশে এরা এমনই অন্ধ যে, এদের কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। বাহ্যত শিক্ষিত মানুষ হয়েও এরা অজ্ঞদের চেয়ে অধিক ঘৃণ্য আচরণ প্রদর্শন করে।

মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কীভাবে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা ও মহিমা তুলে ধরেছেন, এরা তা জানার এবং আহমদীয়া জামা'তের সাহিত্যে এগুলো কত আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয়, তা দেখার চেষ্টাও কখনো করে নি। আরব বা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির ন্যায়পরায়ণ মুসলমানরা যখন সত্য দেখে, জামা'তের বই-পুস্তক এবং সাহিত্য পর্যালোচনা করে আর তাদের সামনে বাস্তবতা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন তারা অবাক হয় যে, এসব নাম-সর্বস্ব আলেম, যারা ইসলামের পতাকাবাহী হওয়ার দাবিদার তারা কত জঘণ্য মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর শিক্ষামালা এবং রচনাবলীকে বিকৃত আকারে উপস্থাপন করে এবং করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং ইসলামের অনুপম শিক্ষার মাহাত্ম্য কত আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন তা দেখে যারা এখনো আহমদী হয় নি, তারা আমাদের টেলিভিশনে যেসব লাইভ বা সরাসরি অনুষ্ঠান হয়, তাতে এবং পত্র মারফতও বেশির ভাগ সময়ে এ কথা স্বীকার করে যে, এই মহান মাকাম এবং মর্যাদার কথা সবে আমরা অবগত হয়েছি। নতুবা এ সব আলেমরা তো আমাদেরকে অজ্ঞতার পর্দাতেই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মানুষের সামনে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়, আহমদীয়াতের শত্রুতায় এরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবচেতন মনে মহানবী (সা.) এবং ইসলামকে দুর্নাম করার কারণ হচ্ছে।

যাহোক, শত্রুতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করাই এসব আলেমের ধর্ম বা অভ্যাস। কাজেই, সরলপ্রাণ মুসলমানরা এর ফলে যতই বিভ্রান্তির শিকার হোক না কেন এরা কখনো সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে না। যাহোক, এ হল তাদের কাজ, যা তারা করবে আর করতে থাকবে। কেননা, তাদের জন্য ধর্মের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ অধিক প্রিয়। কিন্তু চিরাচরিতভাবে এসব বিরোধীর এরূপ কর্মকাণ্ড আমাদের ঈমানে ঊজ্জ্বল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য সারের ভূমিকা রাখা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পাঠের প্রতি পূর্বে মনোযোগ কম থেকে থাকলেও এখন সেই মনোযোগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। শুধু **পাঞ্জাব সরকার কেন? সারা পৃথিবীর সব সরকারও যদি বাধা সৃষ্টি করে, তবুও এ কাজ ব্যহত হতে পারে না। কেননা, এটি মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সাধিত কোন কাজ নয়, বরং এটি খোদা তা'লার কাজ।** তিনিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডারে সমৃদ্ধ করে পাঠিয়েছেন এবং সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা সর্বদা এমনটিই দেখেছি, বড় বড় বাধা-বিপত্তি এবং বিরোধিতার পর জামা'ত আরো বেশি উন্নতি করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে এরা যে পদক্ষেপ নেয়ার আত্মপ্রসাদ নিচ্ছে, এটি খুবই তুচ্ছ একটি বাধা বা প্রতিবন্ধকতা। আমাদেরকে যতই দমনের চেষ্টা করা হয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহরাজির মাত্রা ততই বৃদ্ধি করেন। ইনশাআল্লাহ্ এখনো ভালোই হবে। **তাই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বেশি উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তার প্রয়োজন এ কারণেও নেই** যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এখন ছাপানো হচ্ছে, ওয়েবসাইটেও সহজলভ্য আর বিভিন্ন বই-এর অডিও সংস্করণও রয়েছে। বাকিগুলোও ইনশাআল্লাহ্, অচিরেই সরবরাহের চেষ্টা করা হবে। এমন এক যুগ ছিল, যখন এই দুশ্চিন্তা ছিল যে, আমাদের প্রকাশনার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ হলে ক্ষতি হতে পারে। এখন তো আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায়, জ্ঞান ও তত্ত্বের এই ভান্ডার বায়ুমণ্ডলেও বিরাজমান, একটি বোতাম টিপলেই তা আমাদের সামনে এসে যায়। আমাদের কাজ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধর্মীয় সাহিত্য এবং বই-পুস্তক থেকে বেশি বেশি লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা। আমি ভেবেছি, এখন এমটিএ'তেও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর জন্য দরসের সময় পূর্বের চেয়ে বেশি দেয়া হবে। এভাবে পাকিস্তানের শুধু একটি প্রদেশে আইন প্রণয়নের কারণে সমগ্র বিশ্বে বসবাসকারী আহমদীদের উপকার হবে। **প্রতিটি প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।** আর এতে নতুন নতুন পথ এবং মাধ্যমের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। আর ইনশাআল্লাহ্ এটিও হবে, এর কল্যাণে শুধু মূল ভাষাতেই বই-পুস্তক ছাপান হবে না বা মূল ভাষাতেই দরস প্রদান করা হবে না, বরং অনেক জাতির স্থানীয় ভাষাতেও এসব তথ্য সহজলভ্য হবে। মানুষ আমাকে আশঙ্কার কথা লিখে, তাই বলতে হচ্ছে, কারো হৃদয়ে যদি কোন প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে থাকে, তারা যেন তাদের মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলে দেয়।

আমাদের সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, এর ফলে একটা কথা সুস্পষ্ট আর এটি প্রাঞ্জলভাবে সামনে এসেছে এবং পূর্বেও আসত আর তা হল, এরা যে রসূল (সা.)—এর প্রেমে অনেক এগিয়ে থাকার এবং ইসলামী শিক্ষার পতাকাবাহী হবার দাবি করে আর এ কারণেই আমাদের বিরোধিতা করে বলে দাবি করে, কিন্তু এরা ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের সাহিত্য কোন দিন পড়েও নি আর পড়ার চেষ্টাও করে নি। সচরাচর আমাদের পক্ষ থেকে, এদের দাবির স্বরূপ এবং প্রকৃত চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়ে থাকে, তাই আমি ভেবেছি আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী বা লেখনীর আলোকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরব। আমাদের বিরোধীদের ধারণা অনুসারে এতে ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর পদমর্যাদা পরিপন্থী কথা লেখা হয়েছে, তাঁর (সা.) শিক্ষা বিরোধী কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বা এতে ঘৃণা ও মর্মপীড়াদায়ক বিষয়াদি রয়েছে, নাউযুবিল্লাহ! যদিও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এসব বিষয় অনেক ব্যাপক, তবুও

এগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি এমন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাকাম ও মহান মর্যাদা দেখিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য হতে হয়, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে, সে কি এগুলো শুনে বা পাঠ করে নিজের চোখ এবং কান বন্ধ করে রাখতে পারে? যাহোক, এই ধ্বজাধারি আলেমদের নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। কিন্তু এমন সহস্র সহস্র মানুষ আছে, যারা এমটিএ'এর মাধ্যমে আমাদের কথা শোনে, তাদের সামনে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য এবং আহমদীদের মন-মস্তিষ্ককে আরো আলোকিত করার লক্ষ্যে এবং এর সঠিক জ্ঞান বা ব্যুৎপত্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমি কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরব।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের চমৎকার রীতি

সর্বপ্রথম খোদা তা'লার প্রশংসা এবং **মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠের অপূর্ব যে পদ্ধতি** হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন, তা হল, তিনি (আ.) বলেন, "হে আমার প্রভু! সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা তোমারই প্রাপ্য। কেননা, তুমি আমাদেরকে তোমাকে চেনার পথ স্বয়ং দেখিয়েছ এবং তোমার পবিত্র গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ করে চিন্তা-চেতনার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি থেকে রক্ষা করেছ। দরূদ এবং সালাম হযরত সৈয়্যদুর রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি, যার মাধ্যমে খোদা তা'লা এক পথভ্রষ্ট জাতিকে সুপথে পরিচালিত করেছেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক এবং হিতৈষী রসূল, যিনি পথভ্রষ্ট সৃষ্টিকে পুনরায় সঠিক পথে এনেছেন। তিনি অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহের বিমূর্ত প্রতীক, যিনি মানুষকে শির্ক এবং প্রতিমার নোংরামি থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আলো এবং আলো বিচ্ছুরণকারী, যিনি একত্ববাদের জ্যোতিকে পৃথিবীময় বিস্তৃত করেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান এবং যুগের চিকিৎসক, যিনি বিকৃত হৃদয়কে আবার সততার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বদান্যশীল এবং বদান্যতার মূর্ত প্রতীক, যিনি মৃতদেরকে জীবন শুধা পান করিয়েছেন। তিনি রহীম এবং দয়ালু, যিনি উম্মতের দুঃখে বেদনায় বিমূঢ় ছিলেন এবং কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি পরম সাহসী এবং বীর, যিনি মৃত্যুর মুখ থেকে আমাদেরকে টেনে বের করেছেন। তিনি সেই সহনশীল ও নিঃস্বার্থ মানুষ, যিনি খোদার দাসত্ব করতে গিয়ে মাথা ঝুঁকিয়েছেন আর স্বীয় সত্তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি পরিপূর্ণ একত্ববাদী এবং তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র, যার কাছে খোদার প্রতাপই ছিল পরম প্রিয় এবং বাকি সবাইকে যিনি নিজের দৃষ্টি থেকে অপসারণ করেছেন। তিনি রহমান খোদার শক্তির নিদর্শন, যিনি নিরক্ষর হয়েও ঐশী জ্ঞানে সবার উপর জয়যুক্ত হয়েছেন আর সকল জাতিকে ভুল-ভ্রান্তির মাঝে নিমজ্জিত সাব্যস্ত করেছেন।" **(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭)**

আর যখন কোন মানুষ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয় কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতা লাভ করে, তখন তার উন্নত চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর সবচেয়ে বেশি বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে খোদার নবী এবং বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের মাঝে। আমরা এ ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ দেখি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্তায়। **সমস্যা কবলিত অবস্থায় এবং বিজয়ের যুগে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরিত্র কেমন ছিল?** এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "নবী এবং ওলীদের সত্তার উদ্দেশ্য হল, মানুষের সকল চারিত্রিক গুণাগুণের ক্ষেত্রে তাদেরকে অনুসরণ করা এবং খোদা তা'লা তাদেরকে যেসব ক্ষেত্রে অবিচলতা দান করেছেন, অবিচলতার সেই পথে সকল সত্যান্বেষীর পদচারণা করা। (অর্থাৎ, সে পথে চলার চেষ্টা করবে।) এটি খুবই স্পষ্ট কথা যে, কোন মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব তখনই প্রমাণিত হয়, যখন তা যথাসময় প্রকাশ পায়। (সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের একটি মূর্তকাল থাকে, সময়মত তা প্রকাশ পেলেই সেই গুণটি প্রমাণিত হয়।) আর তখনই মানুষের হৃদয়ের উপর এর প্রভাবও পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেই মার্জনাই নির্ভরযোগ্য এবং প্রশংসনীয় গণ্য হবে, যা প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকাকালীন সময়

প্রদর্শন করা হয়। (কারো মাঝে প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি ক্ষমা করা হয়, তাহলেই এই বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়।) আর সেই পরহেযগারী বা সাধুতাই নির্ভরযোগ্য, যা প্রবৃত্তির অনুসরণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ন থাকে। এক কথায় নবী এবং ওলীদের ক্ষেত্রে খোদা তা'লার অভিপ্রায় হল, তাদের সকল প্রকার চারিত্রিক গুণ প্রকাশ করা এবং তা সাব্যস্ত করে দেখানো। আল্লাহ্ তা'লা এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নের জন্য তাদের আলোকিত জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। (দু'টি অংশ পরিলক্ষিত হয়) যাপিত জীবনের একটি অংশ অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলীর মাঝে অতিবাহিত হয়। আর সব দিক থেকে তাদেরকে দুঃখ দেয়া হয়, নিপীড়ন করা হয়, যেন তাদের সেই উন্নত চরিত্র প্রকাশ পেতে পারে, যা চরম বিপদাপন্ন অবস্থা ছাড়া কোনভাবেই প্রকাশিত ও সাব্যস্ত হতে পারে না।

সেই কঠিন সমস্যা যদি তাদের উপর নিপতিত না হয়, তাহলে কীভাবে প্রমাণ হবে যে, তারা এমন এক জাতি, যারা সমস্যা এলে নিজেদের প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে না, বরং আরো এগিয়ে যায়। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, তিনি সবাইকে ছেড়ে তাদের উপর স্নেহের দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তাদেরকে এর যোগ্য মনে করেছেন, তাঁর জন্য এবং তাঁর পথে দুঃখ-কষ্ট তাদেরকেই দেয়া হবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর বিপদাপদ নাযিল করেন, যেন তাদের ধৈর্য, অবিচলতা, সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, বিশ্বস্ততা এবং পৌরুষ-দীপ্ত (অর্থাৎ বীরত্ব) মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাদের **'আল-ইস্তেক্বামাতু ফাওক্বাল কিরামাহ্'** (অর্থাৎ, অবিচল থাকা মু'জিযা প্রদর্শনের চেয়েও মহান) এই বিষয়টি সাব্যস্ত করেন। কেননা, পূর্ণ সমস্যা ছাড়া পূর্ণ ধৈর্য প্রমাণিত হতে পারে না আর মহান দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা ভয়াবহ ভূমিকম্প ছাড়া প্রকাশ পেতে পারে না। এ সব সমস্যা সত্যিকার অর্থে নবী এবং ওলীদের জন্য আধ্যাত্মিক পুরস্কার, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে তাদের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী প্রকাশ পায়, যে ক্ষেত্রে তারা অনন্য ও অতুলনীয় প্রমাণিত হন এবং পরকালে তাদের পদমর্যাদা উন্নীত হয়। যদি তাদের উপর আল্লাহ্ তা'লা এই বিপদাপদ নাযিল না করতেন, তাহলে এসব নিয়ামতও তাদের লাভ হত না আর জনসাধারণের সামনে তাদের উন্নত গুণাবলীও যথাযথভাবে প্রতিভাত হত না, বরং তারা অন্যান্য লোকের মত তাদের সমান বলেই গণ্য হতেন (তাহলে সবাই একই রকম হতো, কোন পার্থক্য থাকত না)। নিজেদের ক্ষণস্থায়ী জীবন যত বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে অতিবাহিত করুন না কেন অবশেষে তারাও এই পৃথিবী থেকে একদিন চলে যেতেন। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সেই আরাম-আয়েশ এবং বিলাসিতারও কিছুই অবশিষ্ট থাকত না আর পরকালেও সেই মহান মর্যাদা লাভ হত না। এ পৃথিবীতেও তাদের সেই সক্ষমতা, বীরত্ব, বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতা এতটা জগৎখ্যাত হত না, যার কল্যাণে তারা এমন মান্যবর প্রমাণিত হয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার এবং এমন অনন্য সাব্যস্ত হয়েছেন, যার সমকক্ষ কেউ নেই আর এমন অতুলনীয় প্রমাণিত হয়েছেন, যার কোন দ্বিতীয় নেই আর এমন অধরা ব্যক্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছেন, যেখানে অন্য কেউ পৌঁছতে পারে না। অধিকন্তু এত শ্রেষ্ঠ ও বীর প্রমাণিত হয়েছেন, যেন সহস্র সহস্র সিংহ একই বক্ষে আর সহস্র সহস্র চিতা এক দেহে বিরাজমান। যাদের শক্তি এবং সামর্থ্য সবার ধারণার ঊর্ধ্বে আর যা নৈকট্যের সবচেয়ে মহান পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। (এক কথায় এসব কিছু যখন প্রকাশ পায়, তখন তারা খোদার নৈকট্যের সবচেয়ে পরম শিখরে উপনীত হন)। নবী এবং ওলীদের জীবনের দ্বিতীয় অংশ বিজয়, উন্নতি ও সম্পদের ক্ষেত্রে পরম মার্গে উপনীত থাকে, যেন তাদের সেই নৈতিক চরিত্র প্রকাশ পায়, যা প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় বিজয়ী হওয়ার, সৌভাগ্যবান ও সম্পদশালী হওয়ার, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার। কেননা, স্বীয় দুঃখ-কষ্ট দাতাদের অপরাধ ক্ষমা করা, নির্যাতনকারীদের মার্জনা করা, নিজের শত্রুদের ভালোবাসা, অশুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া, সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন না হওয়া, সম্পদের

কারণে অহংকারী না হওয়া, সমৃদ্ধির মাঝে কৃপণতা ও কার্পণ্য না করা, উদারতা-বদান্যতা ও দানের দ্বার উন্মুক্ত রাখা, সম্পদকে রিপুর পূজার মাধ্যম না বানানো, ক্ষমতাকে যুলুম ও অত্যাচারের হাতিয়ার না বানানো। (শাসন ক্ষমতা হাতে আসলে এর মাধ্যমে অন্যায় অত্যাচার না করা)। এ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণের জন্য সম্পদশালী ও ক্ষমতাবান হওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব বৈশিষ্ট্য তখনই সাব্যস্ত হতে পারে যখন ক্ষমতা এবং সম্পদ উভয়ই মানুষের হস্তগত হয়।

অতএব, সমস্যা ও নির্যাতন এবং ধনাঢ্যতা ও ক্ষমতার যুগ (দুর্বলতা ও বিপদসঙ্কুল যুগ এবং ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার যুগ) ছাড়া এই উভয় প্রকার চারিত্রিক গুণ প্রকাশ পেতে পারে না। (অর্থাৎ, এব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দুর্বলতা বা বিজয়ের সময় প্রকাশ পায়, যখন মানুষ বিপদাপদের যুগও পায় আবার ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার যুগও পায়)। তিনি (আ.) আরো বলেন, "তাই মহান ঐশী প্রজ্ঞার দাবি হল, নবী ও ওলীদেরকে এই উভয় অবস্থায় ধন্য করা, যা সহস্র সহস্র নিয়ামতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই উভয় অবস্থা প্রকাশ পাওয়ার যুগ সবার জন্য একই ধারাবাহিকতায় আসে না। (দু'টি অবস্থাই আসে, কিন্তু একই ক্রমান্বয়ে আসে না)। বরং কারো কারো জীবনে ঐশী প্রজ্ঞা শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ জীবনের প্রথম ভাগে নির্ধারণ করে আর কষ্টের যুগ পরে আর কারো কারো ক্ষেত্রে প্রথম অংশে কষ্টের যুগ এসে থাকে আর শেষাংশে তাদের লাভ হয় ঐশী সাহায্য। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এই উভয় অবস্থা গোপন থাকে আবার কারো কারো বেলায় পূর্ণ মাত্রায় তা প্রকাশ পায় (অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গীণভাবে প্রতিভাত হয়)। তিনি (আ.) বলেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হচ্ছেন রসূলকূলের গর্ব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। কেননা, মহানবী (সা.)-এর জীবনে এই উভয় অবস্থা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ, দুঃখ-কষ্টের যুগও সামনে এসেছে আর বিজয়ের যুগও সামনে এসেছে আর এমন ক্রমধারায় এসেছে যে, মহানবী (সা.)-এর সমস্ত চারিত্রিক উৎকর্ষ সূর্যের আলোর ন্যায় ঝলমল করে উঠেছে আর إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (সূরা আল্ কলম: ৫)-এ বর্ণিত বিষয়টি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চারিত্রিক উৎকর্ষ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হওয়া সকল নবীর চারিত্রিক উৎকর্ষেরই প্রমাণ। (তাঁর চরিত্র উভয় ক্ষেত্রে পরমোৎকর্ষ প্রমাণিত হওয়া শুধু তাঁর নিজের চারিত্রিক উৎকর্ষেরই প্রমাণ বহন করে না, বরং সব নবীর চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রমাণ বহন করে। সেটি কীভাবে?) তিনি (আ.) বলেন, কারণ, তিনি (সা.) তাদের নবুয়্যত এবং তাদের ঐশী গ্রন্থাবলীর সত্যায়ন করেছেন (তাদের সত্যায়ন করেছেন) এবং তারা যে খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত ছিলেন তা প্রকাশ করেছেন।

অতএব, এই গবেষণার মাধ্যমে মসীহ্‌র চরিত্র সম্পর্কে যে সন্দেহ হৃদয়ে সৃষ্টি হতে পারে, সেই আপত্তিও দূর হয়ে গেল। অর্থাৎ, মসীহ্‌র ক্ষেত্রে উল্লিখিত উভয় চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং এক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, হযরত ঈসা (আ.) সমস্যার যুগে যেই ধৈর্য ধারণ করেছেন সেই ধৈর্যের যথার্থতা এবং পরাকাষ্ঠা সত্য প্রমাণিত হতে পারত, যদি তিনি (আ.) তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীদের উপর ক্ষমতা এবং বিজয় লাভ করে এ সব নির্যাতনকারীর অপরাধ আন্তরিকভাবে ক্ষমা করতেন (অর্থাৎ, যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের অন্যায় আন্তরিকভাবে যদি ক্ষমা করতেন) যেভাবে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) মক্কাবাসী এবং অন্যান্য লোকদের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করার পর এবং তাদেরকে তরবারির নীচে পেয়েও তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কেবল গুটিকতক সে সব ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছেন যাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ এসে গিয়েছিল। সেসব চির দুর্ভাগা ব্যতিরেকে সব শত্রুর অন্যায় ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বিজয় লাভ করে সবার উদ্দেশ্যে **"লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওম" (অর্থাৎ, আজকের দিনে তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না)**-এর ঘোষণা দিয়েছেন। আর সেই পরম ক্ষমা করার কারণে অর্থাৎ, বিরোধীদের দৃষ্টিতে এটি একটি অসম্ভব বিষয় ছিল এবং নিজেদের দুস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতে তারা

নিজেদেরকে নিজেদের শত্রুর হাতে নিহত হওয়ার যোগ্যই মনে করত। [অর্থাৎ, মহানবী (সা.) এমন মার্জনা প্রদর্শন করেছেন যে, বিরোধীরাও তাদের ভ্রান্তির এবং ভুলের কারণে মনে করত, আমাদের ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব, তারা নিজেদের দুস্কৃতির উপর দৃষ্টিপাত করে ভাবত, এখন আমাদের অপকর্মের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।] তিনি (আ.) বলেন, "এই কারণে সহস্র সহস্র মানুষ এক সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে আর মহানবী (সা.)-এর স্বর্গীয় ধৈর্য, যা দীর্ঘ দিন তাদের ভয়াবহ কষ্টের মুখে তিনি প্রদর্শন করেছেন, সূর্যের মত তাদের সামনে আলোকিত হয়ে উঠে। (তা এমন ধৈর্য ছিল, যা সূর্যের আলোর মত তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়)। আর মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল, কেবল সেই ব্যক্তির ধৈর্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহাত্ম্য তার সামনে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়, যে নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের যুগের অবসানে নির্যাতনকারীর উপর ক্ষমতা লাভ করেও তাকে ক্ষমা করে দেয়।" [অর্থাৎ, দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু ধৈর্য তখনই সঠিক এবং যথাযথ প্রমাণিত হতে পারে, যখন যাকে কষ্ট দেয়া হয় সেই ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা এবং শক্তি লাভ করার পরও যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটিই প্রকৃত ধৈর্য আর মহানবী (সা.) এই আদর্শই দেখিয়েছেন।] তিনি (আ.) বলেন, "এ কারণে হযরত ঈসা (আ.)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও নমনীয়তা সংক্রান্ত চারিত্রিক গুণাবলী যথাযথভাবে প্রমাণিত হয় না আর এটিও সুস্পষ্ট নয় যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর ধৈর্য ঐচ্ছিক ছিল, নাকি অপারগতা? তিনি কষ্ট প্রদানকারীদের অন্যায় মার্জনা করেছেন, নাকি প্রতিশোধ নিয়েছেন, তা প্রমাণ করার কোন উপায় ছিল না। কেননা, ঈসা (আ.) শক্তি ও ক্ষমতার যুগ লাভ করেন নি।

পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী শত শত ঘটনায় যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে, পরীক্ষা করা হয়েছে। আর এ সবের সত্যতা সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়েছে। বদান্যতা ও উদারতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, বীরত্ব ও পৌরুষ, তাকওয়া ও স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং জগৎ বিমুখতা সংক্রান্ত যে সব চারিত্রিক সৌন্দর্য ছিল, তাও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় এত উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত ও দেদীপ্যমান হয়েছে যে, ঈসা (আ.) তো দূরের কথা পৃথিবীতে মহানবী (সা.)-এর পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নি, যার চরিত্র এত স্পষ্টভাবে দীপ্যমান। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর জন্য অগণিত ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন আর তিনি (সা.) এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করেছেন। কোন প্রকার বিলাসিতায় একটি শস্যদানাও ব্যয় হয় নি। (অর্থাৎ, নিজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি কানাকড়িও ব্যয় করেন নি।) কোন অট্টালিকাও নির্মাণ করেন নি আর কোন সৌধও নির্মিত হয় নি। বরং সারাটি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন ছোট্ট একটি মাটির কুটিরে, গরীবদের ঘরের চেয়ে সেই ঘরের অন্য কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। মন্দ আচরণকারীদের উপকার করে দেখিয়েছেন। আর যারা মর্ম যাতনা দিত, তাদেরকে তাদের সমস্যার সময় নিজের সম্পদের মাধ্যমে সুখ দিয়েছেন। প্রায়শ ঘুমানোর জন্য মাটিতে বিছানা পাততেন আর থাকতেন একটি কুঁড়ে ঘরে। খাবার জন্য বেছে নিতেন যবের রুটি বা অনাহারে কাটাতেন। পৃথিবীর ধন-সম্পদ তাঁকে অঢেল দেয়া হয়েছিল কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাতকে বস্তুবাদিতায় বিন্দুমাত্র কলুষিত করেন নি। সব সময় দারিদ্রকে প্রাচুর্যের উপর আর দীনতাকে বিত্ত-বৈভবের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যেদিন পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন, সেদিন থেকে তাঁর প্রিয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ, জীবনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত বা আজীবন) তাঁর একমাত্র সম্মানিত প্রভু ছাড়া অন্য কাউকে কিছুই মনে করেন নি। সহস্র সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে নিহত হওয়া নিশ্চিত বিষয় ছিল এবং চরম বিপদসঙ্কুল স্থানে সম্পূর্ণরূপে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের বীরত্ব, বিশ্বস্ততা এবং অবিচলতা প্রদর্শন করেছেন। এক কথায় বদান্যতা, উদারতা ও সম্পদের প্রতি বিমুখতা, স্বল্পে তুষ্ট

থাকা, বীরত্ব, সাহসিকতা এবং খোদাপ্রেম সংক্রান্ত সকল উন্নত নৈতিক গুণ আল্লাহ্ তা'লা খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্তায় এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পূর্বেও কখনো প্রকাশ পায় নি আর ভবিষ্যতেও প্রকাশিত হবে না।"

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এই পবিত্র সত্তায় এসব অর্থে ওহী এবং রিসালাতকে সমাপ্ত করেছেন অর্থাৎ, সকল উৎকর্ষ গুণাবলী এই উদার সত্তায় পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। **'ওয়া হাযা ফায্লুল্লাহি ইউ'তীহি মাঁইয়াশা'**।" **(বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৬-২৯২ পাদটিকা নং- ১১)**

পুনরায়, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই যে প্রকৃত আলো এবং জ্যোতি ও নূর এই মর্মে এক খ্রিষ্টানের প্রশ্নের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রশ্ন ছিল, "হযরত ঈসা (আ.) নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'তোমরা যারা ক্লান্ত-শ্রান্ত আমার কাছে আস, আমি তোমাদের প্রশান্তি দিব। এছাড়া আমি আলো, আমিই পথ। আমিই জীবন আর আমিই সঠিক পথ।' কিন্তু ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা কি এমন কোন কথা বা শব্দ নিজের জন্য কোথাও ব্যবহার করেছেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৩২) অর্থাৎ, তাদের জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ তা'লাকে যদি ভালোবাস তাহলে আস আমার অনুসরণ কর, যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন। [তিনি (আ.) বলেন,] "আমার অনুসরণে মানুষ খোদার প্রিয়ভাজন হয়ে যায়", এই উক্তি বা প্রতিশ্রুতি– ঈসা (আ.)-এর ঐ কথার চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় ও বস্তুনিষ্ঠ। মানুষ খোদার প্রিয়ভাজন হবে এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কী হতে পারে? অতএব, যার পথ অনুসরণ মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত করে, নিজেকে আলো অভিহিত করার অধিকার তার চেয়ে বেশি আর কার আছে? সে কারণেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-এর নাম 'নূর' রেখেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ (সূরা আল্ মায়েদা: ১৬)। তোমাদের কাছে খোদার পক্ষ থেকে এক নূর আগমন করেছে।" **(সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কে চার সওয়ালো কা জওয়াব, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খণ্ড, পৃ: ৩৭২)**

এরপর **মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসা এবং তাঁকে অনুসরণ করা মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন করে,** এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কাউকে ভালোবাসার জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন তাহল, এমন ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণকারী হতে হবে।" [অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে যদি অনুসরণ কর, তাহলে আমার ভালোবাসা লাভ করবে।] তিনি (আ.) বলেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হল, আন্তরিকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা অবশেষে মানুষকে খোদার প্রিয়ভাজন বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ, তার হৃদয়ে তা খোদা প্রেমের এক বেদনা সৃষ্টি করে। এর ফলে এমন ব্যক্তি সব কিছুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর আল্লাহ্ তা'লাই তার প্রেম ও ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যান। তখন আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার একটি বিকাশ বা প্রতিফলন তার উপর হয়। তখন তিনি তাকে প্রেম ও ভালোবাসার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করে জোরালো আকর্ষণের মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং এর ফলে সে নিজের কামনা-বাসনার উপর জয়যুক্ত হয়। আর তার সাহায্য ও সমর্থনে সকল দিক থেকে খোদা তা'লার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন নিদর্শনের আকারে প্রকাশ পায়। **(হকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮)**

এরপর **সর্বাধিক কামেল এবং পূর্ণ নবী মহানবী (সা.)**, এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, সেই মানব, যিনি নিজ সত্তায়, নিজ গুণাবলীতে, তাঁর কাজে-কর্মে, তাঁর আধ্যাত্মিক এবং পবিত্র শক্তিবৃত্তির প্রবল বেগে প্রবহমান সমুদ্রের মাধ্যমে জ্ঞান, কর্ম, সাধুতা ও দৃঢ়তায় সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং পূর্ণ মানব অভিহিত হয়েছেন। ... সেই মানব, যিনি

সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট নবী ছিলেন এবং পরম আশিস নিয়ে এসেছেন। যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম কিয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে এবং এক মৃত জগৎ পুনরায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেই কল্যাণমণ্ডিত নবী হচ্ছেন খাতামুল আম্বীয়া, ইমামদের নেতা, খাতামুল মুরসালীন, ফখরুন্ নবীয়ীন, জনাবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। হে আমাদের খোদা! তুমি সেই প্রিয়তম নবীর উপর সেই রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর, যা তুমি পৃথিবীর আদিকাল থেকে অদ্যাবধি অন্য কারও প্রতি বর্ষণ কর নি। যদি এই মহান ও মহামহিমান্বিত নবী পৃথিবীতে না আসতেন, তাহলে যে সব ছোট ছোট নবী এসেছেন, যেমন হযরত ইউসুফ, আইয়্যুব, মসীহ্ ইবনে মরীয়ম, মালাকি এবং ইয়াহিয়া ও যাকারিয়া প্রমুখ, তাদের সত্যতার স্বপক্ষে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ থাকত না। যদিও তারা সবাই ছিলেন খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত ও সম্মানিত কিন্তু এটি সেই নবীরই কৃপা বা অনুগ্রহ যে, তারা সবাই পৃথিবীতে সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন। **আল্লাহুম্মা সাল্লে ওয়া সাল্লিম ওয়া বারেক আ'লাইহে ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়ীন।**" (ইতমামুল হুজ্জাত, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

এরপর মহানবী (সা.)-এর কতক অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "তিনি আমাদের জন্য এমন এক রসূল (সা.) প্রেরণ করেছেন, যিনি অতিশয় উদার। সমস্ত কল্যাণকর বিষয়ে পরাকাষ্ঠা তাঁরই। উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সকল অর্থে সকলভাবে তিনিই অগ্রগামী। সব নবী এবং রসূলের তিনিই খাতাম। উম্মুল কুরা বা মক্কায় আবির্ভূত প্রতিশ্রুত নবী, যিনি সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মদ (সা.)। কেননা, তাঁর হাতে কল্যাণমণ্ডিতরা সব সময় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তিনি এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য। কেননা, তিনি উম্মতের জন্য চরম দুঃখ-কষ্ট শিরোধার্য করেছেন আর ধর্মের অট্টালিকাকে সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন। আর তিনি আমাদের জন্য এক প্রদীপ্ত গ্রন্থ এনেছেন। এ কারণেও যে, খোদা তা'লার পয়গাম এবং বার্তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন প্রকার আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হতে হয়েছে আর এ কারণেও যে, পূর্বের বিভিন্ন গ্রন্থে যে বিষয়গুলো অসম্পূর্ণ ছিল, তা তিনি সম্পূর্ণ করেছেন আর আমাদেরকে বাড়াবাড়ি করা থেকে এবং অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এক পবিত্র শরীয়ত দিয়েছেন এবং নৈতিকতাকে উৎকর্ষতায় পৌঁছিয়েছেন। যা অসম্পূর্ণ ছিল তা সম্পূর্ণ করেছেন। পৃথিবীর সকল জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ কথা এবং অতি সমুজ্জ্বল ওহীর মাধ্যমে হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট করেছেন ও সৃষ্টিকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। আর স্বীয় আদর্শের মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপদ তীরে টেনে এনেছেন। পশুতুল্য মানুষকে বাকশক্তির অধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ, যারা পশুর মত থাকত, যারা নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং যাযাবরের মত ছিল, তাদেরকে ভাষা শিখিয়েছেন, ভাষাকে শালীন করেছেন, তাদের চরিত্র উন্নত করেছেন।) হিদায়াতের প্রাণ ফুৎকার করেছেন এবং তাদেরকে সব নবীর উত্তরাধিকারী করেছেন। তাদেরকে এমনভাবে পূত-পবিত্র করেছেন যে, তারা খোদার সন্তুষ্টিতে আত্মবিলীন হয়ে গেছেন আর আল্লাহ্ তা'লার জন্য তারা পানির মত নিজেদের রক্ত ঝরিয়েছেন আর পূর্ণ আনুগত্যের প্রেরণায় সম্পূর্ণরূপে নিজেদেরকে আল্লাহ্র হাতে সমর্পন করেছেন।

পক্ষান্তরে তিনি দুষ্প্রাপ্য, অপ্রকাশিত, বহু পর্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন, গূঢ় তত্ত্ব শিখিয়ে আমাদের মত লোকদের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন, যারা তার দস্তর খানের উচ্ছিষ্ট ভোগী। চরিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি উৎকর্ষতা দান করেছেন আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর পথ প্রদর্শনের কল্যাণে খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পথ আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও তিনি আমাদেরকে উপরে নিয়ে গেছেন আর মাটির গহ্বর থেকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। হে আল্লাহ! শাস্তি ও পুরস্কার দিবস পর্যন্ত চিরকাল মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। অধিকন্তু তাঁর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বংশ, তাঁর

সাহাবীদের উপরও, যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহায্যকারী হয়েছেন এবং সাহায্যও লাভ করেছেন, যারা খোদার মনোনীত এবং নির্বাচিত জামা'ত, যারা নিজেদের প্রাণ, সম্মান এবং নিজেদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, রাযি আল্লাহু আনহুম আজমায়ীন। **(আল-বালাগ, রূহানী খাযায়েন, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪, মুহামেদ খাতামান্নাবীঈন সারওয়ারে আম্বিয়া হাবীবে খোদা (সা.) মুসাম্মা বিহি দুররে ইয়াতিম আয মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত পৃ: ৩০২)**

এরপর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পদমর্যাদা এবং খাতামিয়্যাতের কল্যাণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার নবী ও রসূল আর মহানবী (সা.)-এর ধর্ম সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর আমরা এ কথার উপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামুল আম্বিয়া। তাঁর পর কেবল সেই নবীই আসতে পারে যার তরবীয়ত কেবল তাঁর কল্যাণরাজির মাধ্যমেই হবে এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর অধীনে তিনি আসবেন এছাড়া আর কোন নবী আসতে পারে না। ... খতমে নবুয়্যতের অর্থ হল আমাদের নবী, যিনি নবী ও রসূলদের শিরোমণি, তাঁর সত্তায় এই পরাকাষ্ঠা পূর্ণ হয়। আর আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, তাঁর পর সেই নবীই আসতে পারেন, যিনি তাঁর উম্মত থেকে হবেন, তাঁর পূর্ণ অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যিনি পুরো কল্যাণরাজি তাঁর আধ্যাত্মিকতা থেকেই লাভ করবেন এবং তাঁর জ্যোতিতেই আলোকিত হবেন আর এছাড়া আর কোন নবী আসতে পারে না। ......আর এ কথাই সত্য, যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কল্যাণরাজির সাক্ষী। আর তা মানুষকে তাঁর সেই সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত করে, যা তাঁর সত্যিকার অনুসারীদের তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা বা নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর এর বিরুদ্ধে বিতর্ক করা হল, অজ্ঞতা। বরং এটিতো খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর আবতার বা অপুত্রক না হওয়ার প্রমাণ। আর চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে এর কোন বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ারও প্রয়োজন নেই। কেননা, মহানবী (সা.) দৈহিক দিক থেকে কোন পুরুষের পিতা ছিলেন না, কিন্তু তিনি (সা.) আধ্যাত্মিকতার নিরিখে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য রিসালাতের কল্যাণরাজির প্রস্রবণের নিরিখে তাদের সবার পিতা। তিনি সব নবীর খাতাম এবং সকল গৃহীতজনের নেতা। যার কাছে তাঁর মোহরের ছাপ থাকবে এবং তাঁর সুন্নতের যে অনুসারী হবে, সে ছাড়া কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কখনো গৃহীত হতে পারে না। আর কোন কর্ম, কোন ইবাদত তাঁর রিসালাতকে স্বীকার না করে, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর জামা'তের দৃঢ়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া গৃহীত হতে পারে না। যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করেছে আর নিজের পুরো শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োজিত করে তাঁর সকল সুন্নতের অনুসরণ করে নি, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাঁর পর কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। আর কোন কিছু তাঁর গ্রন্থ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধকে রহিতকারী বা তাঁর পবিত্র কথার পরিবর্তনকারী আসতে পারে না। কোন বৃষ্টি তাঁর বারিধারার মত হতে পারে না। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআনের অনুসরণ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি সফল হতে পারে না বা মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব বিষয়ের অনুসরণ না করবে, যা আমাদের সম্মানিত রসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ-নিষেধ বা শিক্ষককে বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করে, সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়। যে ব্যক্তি এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও নবুয়্যতের দাবির পাশাপাশি এই বিশ্বাস রাখে না যে, তার তরবীয়ত হয় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কল্যাণরাজি থেকে আর তাঁর আদর্শের অনুসরণ ছাড়া এর কোন অর্থই নেই আর পবিত্র কুরআন খাতামুশ্ শরীয়ত অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ শরীয়ত, এমন ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং নিকৃষ্ট কাফির ও পাপাচারী। আর যে ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করে অথচ এই বিশ্বাস রাখে না যে, সে তাঁর অন্তর্ভুক্ত আর যা কিছু পেয়েছে তাঁর (সা.)-ই কল্যাণরাজি থেকে পেয়েছে আর সে তাঁর বাগানের একটি ফল এবং তাঁর বারিধারার একটি বিন্দু ও তাঁর জ্যোতির একটি কিরণ, এমন ব্যক্তি অভিশপ্ত। এমন ব্যক্তির উপর এবং তার সাহায্যকারী,

অনুসারী, সাথী সবার উপর খোদার অভিসম্পাত। এখন আকাশের নিচে আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে ছাড়া কোন ব্যক্তি নবী হতে পারে না আর পবিত্র কুরআন ছাড়া আমাদের আর কোন গ্রন্থ নেই। যে ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে, সে নিজেই নিজেকে দোযখে নিক্ষেপ করে।" **(মওয়াহেবুর রহমান, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ২৮৫-২৮৭, মুহামেদ খাতামান্নাবীঈন সারওয়ারে আম্বিয়া হাবীবে খোদা (সা.) মুসাম্মা বিহি দুররে ইয়াতিম আয মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬ সনে প্রকাশিত পৃ: ৩১৯-৩২০)**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **এখন একমাত্র শাফী বা যোজক হলেন, মহানবী (সা.)**। তিনি বলেন, "আদম সন্তানের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে এখন কুরআন ছাড়া অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই আর সমস্ত আদম সন্তানের জন্য মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কোন শাফী বা যোজক নেই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন রচনা করার চেষ্টা কর। কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না, যেন তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে পার। মনে রেখ! নাজাত বা মুক্তি এমন কোন বিষয় নয়, যা কেবল মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। বরং প্রকৃত নাজাত সেটি যা এ পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে? সে-ই, যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তা'লা সত্য আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে মধ্যবর্তী শাফী বা যোজক। আকাশের নিচে তিনিই সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মাঝে শাফী এবং শাফায়াতকারী আর আকাশের নিচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নেই এবং পবিত্র কুরআনের সমমর্যাদার অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। আল্লাহ্ তা'লা অন্য কাউকে চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত। ... মূসা সেই ধনভান্ডার লাভ করেছিলেন, যা প্রথম যুগের লোকেরা খুইয়ে বসেছিল। আর মুহাম্মদ (সা.) সেই ধনভান্ডার লাভ করেছেন, যা মূসার জামা'ত হারিয়ে ফেলেছিল। এখন মুহাম্মদী বিধান মূসাঈ বিধানের স্থলাভিষিক্ত কিন্তু মহিমায় বা মর্যাদার নিরিখে সহস্র সহস্র গুণ শ্রেয়। মসীলে মূসা মূসার চেয়ে সহস্র সহস্র গুণ বড় আর ইবনে মরিয়মের চেয়ে মসীলে ঈসা বড় মর্যাদা সম্পন্ন।" **(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃ: ১৩-১৪)**

অতএব, এই কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি সেসব অগণিত উদ্ধৃতির মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাকাম এবং মর্যাদা সম্পর্কে লিখেছেন। একইভাবে ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কেও এক ধনভান্ডার তিনি (আ.) রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তা থেকে সমধিক কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার তৌফক দান করুন আর ইসলামের নামধারী এসব ধ্বজাধারীকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিন, যেন তারা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের কথা শুনে এবং জনসাধারণকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি হল, কাদিয়ানের দরবেশ মূসা সাহেবের। তিনি ২০১৫ সালের ১০ মে তারিখে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি সচল ছিলেন। মৃত্যুর চার দিন পূর্বে আহমদীয়া চক বা মোড়ে দুর্ঘটনাবশত পড়ে যাওয়ার কারণে কানপট্টিতে আঘাত পান। চার দিন অমৃতসর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর নূর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তিনি মূসী ছিলেন আর প্রথম খিলাফতের যুগে তার পরিবার বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুম শেখুপুরা জেলার সৈয়্যদওয়ালা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৯৪৬ সনে সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি যখন কাদিয়ানে বসতি স্থাপন করেন, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী করছেন? তিনি বলেন, আমি সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। তিনি (রা.) বলেন, আপনার খিদমতের আমাদের প্রয়োজন রয়েছে, আপনি হিজরত করে পাকিস্তানে যাবেন না, বরং কাদিয়ানেই বসবাস করুন। তখন দেশ বিভক্ত হচ্ছিল। ১৯৪৭ সালের কথা। তিনি কাদিয়ানেই অবস্থান করেন। আর এভাবে তিনি কাদিয়ানের তিনশ' তেরজন দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত হন। বড় সফলতার সাথে দরবেশী জীবন

অতিবাহিত করেন। বছরের পর বছর তিনি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন বিভাগে এবং বিশেষ করে দারুল মসীহ্‌তে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম ২০০৬ সনে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় দরবেশদের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণের তৌফিক পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক বয়আতেও তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন, তিনি সর্বাগ্রে বসেছিলেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'কন্যা এবং তিনজন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার ছেলে জনাব লতিফ সাহেব জামা'তের খিদমত থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তার স্ত্রী ২০১৪ সনের ৩০ মে তারিখে ইন্তেকাল করেন। তিনি তার দরবেশ স্বামীর সাথে পরম ধৈর্যের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিকেও জ্যেষ্ঠদের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, সাহেবযাদী সৈয়্যদা আমাতুর রফিক সাহেবার, যিনি হযরত সৈয়্যদ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.)-এর কন্যা ছিলেন। তিনি ২০১৫ সালের ৬ মে তারিখে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত মীর মুহাম্মদ ইমাঈল সাহেব দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম পক্ষের কোন সন্তান ছিল না। দ্বিতীয় বিয়ে করেন ১৯১৭ সনে শ্রদ্ধেয়া আমাতুল লতীফ বেগম সাহেবাকে। তার গর্ভে আল্লাহ্‌ তা'লা তাকে সাতজন কন্যা এবং তিনজন পুত্র সন্তান দান করেছেন। সাহেবযাদী আমাতুর রফিক সাহেবা ছিলেন অষ্টম সন্তান। নীরব প্রকৃতির, জ্ঞান সমৃদ্ধ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার পুত্র হামীদুল্লাহ্‌ নুসরত পাশা সাহেব ফযলে উমর হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি লিখেন, আমার পিতা হযরত উল্লাহ্‌ পাশা সাহেব ১৯৫৩ সনে আমেরিকায় অধ্যয়নরত অবস্থায় আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সনে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আমার পিতার কাছে আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বলেন, আমাদের দু'জন মামা ছিলেন। বড় মামা অনেক বড় সূফী ছিলেন অর্থাৎ, হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব। তিনি হযরত আম্মাজান এর ভাই ছিলেন আর ছোট মামাও অনেক বড় আলেম ছিলেন অর্থাৎ, হযরত মীর ইসহাক সাহেব।

মিয়া বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি আপনাকে আমার বড় মামার কন্যা আমাতুর রফিক সাহেবার বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি। তার পিতা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবকে বলেন, আমার আত্মীয়-স্বজন সবাই অ-আহমদী। আমি কীভাবে এখানে আত্মীয়তা করতে পারি আর কীভাবে তাদেরকে একথা বলব। তিনি বলেন, আপনার মুরব্বী বা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আমি কথা বলব। ৫ নভেম্বর, ১৯৬১ সনে তার নিকাহ্‌ হয়। সেই দিনই কনে স্বামীর বাড়ীতে যান। হযরত সৈয়্যদা মরিয়ম সিদ্দীকা সাহেবা, ডাক্তার নুসরত পাশা সাহেবকে বলেছেন, তোমার মায়ের যখন বিয়ে হয়, তখন মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) অসুস্থ ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বিয়ের দোয়া পড়ান আর তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। এরপর যখন হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.)-এর সাথে দেখা করতে আসেন, তখন বের হওয়ার সময় হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) এ সংবাদ পাঠান যে, হযরত উল্লাহ্‌ পাশা, যার সাথে আমাতুর রফিক সাহেবার বিয়ে হয়েছিল তাকে বলে দাও, আমি আপনাকে আমার কন্যা দিয়েছি।

যেমনটি আমি বলেছি, তার ছেলে হামীদুল্লাহ্‌ নুসরত পাশা সাহেব, ওয়াকেফে যিন্দেগী। ফযলে উমর হাসপাতালে তিনি ডেন্টাল সার্জন। দ্বিতীয় ছেলে খিযির পাশা দুবাইতে বসবাস করেন। তার এক কন্যা ফারহানা পাশা ওয়াকেফে যিন্দেগী ড. গোলাম আহমদ ফারুক সাহেবের স্ত্রী। ফারুক সাহেব রাবওয়াতেই কম্পিউটার বিভাগে কাজ করেন। আমাতুর রফিক সাহেবা দীর্ঘদিন করাচির নায়েব সদর হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। হাঁটুর কষ্ট সত্ত্বেও তিনি সব জায়গায় পৌঁছে যেতেন। অফিস উঁচু ভবনে ছিল। সেখানে বারবার যাওয়ার কারণে তার কষ্ট

বেড়ে যেত, তারপরও তিনি দায়িত্ব পালন বন্ধ করেন নি। গরীব-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। গরীবদের অসাধারণভাবে সাহায্য করতেন এবং তা গোপন রাখতেন।

খিলাফতের সাথে তার এমন সুগভীর সম্পর্ক ছিল যে, খিলাফত বিরোধী কোন কথাই সহ্য করতে পারতেন না। ১৯৭৪ সনে উদ্ভূত পরিস্থিতির মাঝে তাদের ঘরে কিছু অতিথি আসে এবং খাবার টেবিলে কেউ বলে, সংসদে বক্তব্য দেওয়ার সময় খলীফাতুল মসীহ্ সালেসকে এভাবে নয় বরং ওভাবে বলা উচিত ছিল। তিনি তখনই আঙ্গুলের ইশারায় কঠোরভাবে বারণ করেন আর বলেন, এর বেশি এক শব্দও আমি শুনতে চাই না। সেখানেই কথা থামিয়ে দেন। পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল খিলাফতের সাথে।

এরপর খোদার সাথেও তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন অবসর ভাতা দিয়েই আমাদের সংসার চলত। অবস্থা ছিল অস্বচ্ছল। একদিন আমার মা (অর্থাৎ, আমাতুর রফিক সাহেবা) আমার উপস্থিতিতে আমার আব্বাকে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমাকে **"ওয়াল্লাহু খায়রুর রাযিকীন"**-এর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এরপর তার স্বামীকে বিশ্বব্যাংক-এ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং কন্সালটেন্সির (ঈড়হংঁষঃধহপু) ফিসও পেতে থাকেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় উপার্জন বেড়ে যায়। জাগতিকতার প্রতি তার কোন মোহ ছিল না। তার মেয়ে ফারহানা পাশা সাহেবা লিখেছেন, আমার মায়ের সব জিনিসপত্র গোটাতে আমাদের মাত্র পনের মিনিট সময় লেগেছে। তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তার শ্বশুরকুলের সবাই অ-আহমদী ছিল। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নসীহত করেছেন, সব সময় অ—আহমদী আত্মীয়-স্বজনের যত্ন-আত্তি করবে। তিনি বলেন, মা এই নসীহতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন পিতার অ—আহমদী আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, যারা কেবল আত্মীয়-স্বজনই নয় বরং বিভিন্নভাবে বিরোধিতাও করত, এই বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছেন আর মৃত্যুর সময় তাদের ভেতর অনেকেই স্বীকার করেছেন, তার মত আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষী আর কেউ ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ০৫-১১ জুন ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা, ২৩, পৃ: ৫-৯)
কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।